লিজা ও অ্যানির ক্রিস্টমাস
(একটি সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে রচিত)
খন্দকার জাহিদ হাসান

সিডনী থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরের এক সাবার্ব বা মহল্লাতে সৈকত বাসা ভাড়া নিয়েছিল। প্রথম দিনই তার পরিচয় হল একেবারে পাশের বাড়ীর প্রতিবেশিনী লিজার সাথে। সেই দিনটির কথা মনে পড়লে আজও সৈকতের হাসি পায়। হড়বড় করে একেবারে অস্ট্রেলীয় কথ্য ইংরেজিতে কি যেন সব একগাদা প্রশ্ন করেছিল লিজা তাকে। ওর বেশীর ভাগ কথাই সৈকত বুঝতে না পেরে হা করে লিজার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা প্রশ্ন সে ধরতে পারল, "হাউ ম্যানি কিড্স ইউ'ভ গট?" বাংলাদেশে শিশুকালে ইংরেজিতে হাতেখড়ির দিনগুলো হতেই সৈকত শিখে এসেছে যে, 'কিড্' মানে ছাগলছানা। কিন্তু ওর আরেকটা অর্থ যে মানুষের বাচ্চাও হতে পারে, তা ঘুণাক্ষরেও জানত না সে তখন। তাই সে যতোই লিজাকে বার বার বোঝাতে চেষ্টা করল যে, সে কোনো ছাগল পালে না, তার কোনো ছাগলছানাও নেই, ততোই মরিয়া হয়ে লিজা তাকে একই প্রশ্ন করে চলল। শেষে আরেক রসিক প্রতিবেশী বিল সমস্যাটা ধরতে পেরে হাসতে হাসতে ওর নিজের দুই বাচ্চাকে টেনে আনল, তারপর ওদের দিকে আঙ্গুল নির্দেশ করে সৈকতকে জিজ্ঞেস করল, "হাউ ম্যানি ইউ'ভ গট লাইক দিজ?" এতক্ষণে সৈকতের কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল। প্রাণপণে মাথা ঝাঁকাল সে, "না, আমার কোনো কিড্ নেই, বিয়েই করিনি আমি এখনো।" ওর মাথা ঝাঁকানোর ধরণ দেখে লিজা ও বিল খুব হেসেছিল সেদিন।

আরেক সমস্যা দেখা দিল নাম ডাকা নিয়ে। লিজা তাকে জানাল যে, তার আসল নাম 'এলিজাবেথ' হলেও তাকে সবাই 'লিজা' নামে ডাকে। বিলের আসল নাম নাকি উইলিয়াম, যার সংক্ষিপ্ত রূপ হল বিল। কিন্তু সৈকতের নাম ওরা ঠিক মতো উচ্চারণ করতে পারল না- শুধু 'স্যাই' বলে ডাকতে শুরু করল ওকে। শেষ পর্যন্ত সৈকতের অনুরোধে 'স্যাইক্যাট' নামে ডাকাই সাব্যস্ত হল।

কিছুদিনের মধ্যেই সৈকত টের পেলো যে, জায়গাটা প্রধানত নিম্নবিত্ত শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত এবং কিছুটা অনুন্নত। উচ্চশিক্ষিত কেউ নেই বললেই চলে। বাংলাভাষী কাউকেই চোখে পড়ল না। প্রতিবেশীদের বেশীর ভাগই সহজ-সরল মানুষ, তবে পরস্পরের ব্যাপারে কৌতূহলহীনতা সম্ভবত শ্বেতাঙ্গদের একটা মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য। লিজাও শ্বেতাঙ্গিনী, কিন্তু অন্যদের চাইতে সে একটু ভিন্ন। সারাক্ষণ বকবক করতে ভালবাসত সে। না, লিজা কোনো সুন্দরী তন্বী নয়। বরং মোটাসোটা আর গবেট গোছের এক রমণী। পরে বিলের কাছে সৈকত শুনেছিল যে, লিজা আসলে মানসিক প্রতিবন্ধী। তবে ওর প্রতিবন্ধিতা খুব বেশী মাত্রার নয়। আর এই প্রতিবন্ধিতা সে পেয়েছে তার বাবার কাছ থেকে। লিজার মা-বাবার ছাড়াছাড়ি হয় যখন ওর বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। তার মা পামেলার কাছেই সে বড় হয়। লিজার বয়স যখন দশ, তখন তার মা টেড নামের এক কার্পেনটারকে বিয়ে করে।

সাত-আট বছর মা আর সৎ বাবার সংসারে থাকার পর অবশেষে লিজার কপালে এক বয়ফ্রেন্ড জুটল। ওর বয়স তখন আঠারো। একমাত্র মেয়ে অ্যানির জন্মলাভের মাত্র সাত মাসের মাথায় লিজার ছেলেবন্ধু তাকে ছেড়ে চলে যায়। এখন সে কেবল অ্যানিকে নিয়ে সরকারী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হাউজিং কমিশনের বাসায় থাকে, আর 'ডোল' বা সরকারী ভাতায় সংসার চালায়। সৈকত অনেকদিন পর্যন্তই জানত না যে,

লাগোয়া প্রতিবেশী লিজাদের এই বাসাটি হাউজিং কমিশনের। সেন্টারলিংক নামের ডোল অফিস থেকে বহুবারই লিজাকে সহজ পেশাভিত্তিক বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণে ও কাজে পাঠানো হয়েছে। নাহ্, প্রতিবারই সে গাড্ডা মেরেছে। শেষ পর্যন্ত সেন্টারলিংক হাল ছেড়ে দিয়েছে।

অ্যানি কিন্তু তার মা লিজার মতো মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে জন্মায়নি- বরং সে পুরোপুরি সুস্থ, স্বাভাবিক আর চমৎকার এক মেয়ে। চৌদ্দ বছরের তরতাজা আকর্ষণীয় স্কুলছাত্রী অ্যানি এবার ইয়ার টেনে উঠবে। লেখাপড়াতেও সে ভাল। তার অনেক স্বপ্ন সে একদিন ইউনিভার্সিটি পেরোবে, ভাল চাকুরী করবে, মাকে নিয়ে এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে আর খুব ভাল অঞ্চলে সুন্দর একটা বাসা নেবে।

সত্যি কথাটি হল, লিজার সংসারে চালচুলোরও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তাই প্রায়ই সে মেয়েকে নিয়ে তার মা পামেলার বাসাতে চলে যায়। ওখানে সারাদিন থাকে আর মায়ের হাতে রাঁধা সুস্বাদু সব খাবার খেয়ে দিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় মেয়েকে নিয়ে বাসায় ফিরে আসে। এক শনিবার সকালে সৈকত তার গাড়ী নিয়ে শপিং-এ বেরুচ্ছিল। হঠাৎ লিজা এসে ধরল, "স্যাইক্যাট, আমাদেরকে একটু আমার মা'র বাসায় নামিয়ে দেবে? বেশী দূরে নয়। তোমার দেরী হবে না। অ্যানি তোমাকে রাস্তা দেখাবে।" কি আর করা! লিজার সম্ভবত টাকাপয়সার টানাটানি চলছিল। হয়তো বাসভাড়াও ছিল না ঐ মুহূর্তে ওর হাতে। অ্যানি সৈকতের পাশের সীটে বসে ওকে রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে গেল। ওদেরকে নামাতে গিয়ে লিজার মা পামেলার সাথে পরিচয় হয়ে গেল সৈকতের। বাসার সামনে ফুলগাছে পানি দিচ্ছিলেন ভদ্রমহিলা। ষাটোর্ধ পামেলাকে দেখে লিজার মা বলে মনেই হয়না। দুজনের চেহারাও পুরোপুরি ভিন্ন। বরং নাতনী অ্যানির সাথেই পামেলার চেহারার বেশী মিল। এই বয়সেও ছিপছিপে একহারা গড়ন তাঁর।

তারপর থেকে সুযোগ পেলেই সৈকতের গাড়ীতে ছোট-খাটো লিফট নেবার বাতিক লিজা আর অ্যানিকে পেয়ে বসল। প্রথম প্রথম সৈকত মনে মনে একটু বিরক্ত হলেও আস্তে আস্তে ব্যাপারটা সে বরং উপভোগ করতেই শুরু করল। অ্যানি সব সময়ই ওর পাশের সীটে বসত। আর তার মা লিজা বসত পেছনের আসনে। মাঝে মাঝে সৈকতের কাছে অ্যানি ক্লাসের অংকও বুঝিয়ে নিতে আসত। যদিও সে বয়সে বেশ ছোট, তবু সৈকত এক ধরণের প্রেমে পড়ে গেল মেয়েটার। আজকাল অ্যানিকে দেখলেই মনে মনে সে গাইতে থাকেঃ "আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী..."। কাটা কাটা চেহারা মেয়েটার। আবার কেমন যেন মায়াও হয় ওর জন্য। বাবা নেই, মা-ও অটিস্টিক। প্রায় অ্যানির কথা ভাবে সে। আচ্ছা, মেয়েটা ম্যাকডোনাল্ড বা কেএফসি-তে পার্ট-টাইম কাজ করলেই তো পারে। সংসারের টানাটানিটা একটু কমে তাহলে। স্কুলের কতো ছাত্র-ছাত্রীই তো এদেশে খন্ডকালীন কাজ করে কিছু হাত খরচ যোগায়। পরক্ষণেই আবার সৈকত ভাবে, নাহ্, যে সিরিয়াস ছাত্রী! লেখাপড়ার ক্ষতি হতে পারে ভেবে অ্যানি হয়তো পার্ট-টাইম কাজ করতে চায় না! কে জানে বাবা!... ইয়ে, সে কি কিছু আর্থিক সাহায্য করতে পারে না ওদের মা-মেয়েকে? বেশী নয়, এই দু'দশ ডলার? ভাবতে ভাবতে সৈকত খেই হারিয়ে ফেলে। লজ্জাও পায় নিজেই নিজের কাছে। এতটুকুন একটা মেয়েকে নিয়ে কি সব ভাবছে সে আজকাল! আর তা ছাড়া কি দরকার যেচে পড়ে ওদেরকে সাহায্য করতে যাওয়ার। বরং যেভাবে চলছে চলুক না- ওকে এই অংকটা বোঝানো, কিংবা গাড়ীতে করে এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া। মন্দ কি!

এরপর আরও কয়েকবার লিজার মা পামেলার সাথে সৈকতের দেখা হয়েছে- লিজাদের বাসায়, কিংবা লিজাদেরকে গাড়িতে লিফট দিতে গিয়ে। একদিন বিলের কাছে সৈকত শুনল যে, ইদানীং নাকি লিজার মা পামেলা আর তাদের কোনো খোঁজখবর নিচ্ছে না। সৈকত নিজেও ব্যাপারটা টের পেয়েছে। ক্রিস্টমাস প্রায় এসে পড়েছে। প্রতি বছর লিজা আর অ্যানি পামেলার কাছ থেকে দামী ক্রিস্টমাস উপহার পেয়ে এসেছে। বিনিময়ে লিজা গরিবি হালে মাকে দিয়েছে সস্তা কোনো উপহার। কিন্তু এই প্রথমবার লিজার মা পামেলা তাদেরকে কোনো ক্রিস্টমাস উপহার দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। সম্প্রতি পরপর দুই বার মা'র বাসা থেকে ফিরে আসতে হয়েছে লিজা আর অ্যানিকে। লিজার সৎ বাবা টেড তাদের বাড়ীর দোরগোড়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে, বলেছে পামেলা নাকি বাসায় নেই। কোথায় গিয়েছে, তাও বলেনি টেড। মা তাদের সঙ্গে এমন করছে কেন, এভাবে তাদেরকে এড়িয়ে চলছে কেন, তা বুঝে উঠতে পারছে না লিজা। লিজা জানে না এবার সে ক্রিস্টমাস কোথায় কাটাবে, কীভাবে মেয়েকে বোঝাবে যে, এবার ক্রিস্টমাসে তাদের জন্য মজার কোনো লাঞ্চ নেই। মা পামেলা ছাড়া তাদের যে আর কোনো আপনজন নেই। সে নিজে তো এক অযোগ্য মা! চাপা অভিমানে লিজার বুকটা ভেঙ্গে পড়তে চায়।

ইদানীং লিজা ও অ্যানির মুখের দিকে চাইতে বেশ কষ্ট হয় সৈকতের। সারাক্ষণ বিষণ্নতায় ভরা থাকে মা-মেয়ের মুখমণ্ডল। আবারও নতুন করে ভাবতে শুরু করে সৈকত, আর দুদিন বাদে ক্রিস্টমাস। ওদের দুজনের জন্য ভাল ভাল কিছু খাবার কিনে আনবে কি সে? নতুবা দামী খাবারের বেশ কিছু উপকরণ কিনে এনে ওদের হাতে তুলে দিলেই তো হয়, যাতে ওরা নিজেদের হেঁশেলেই রান্না করে নিতে পারে। অথবা দুজনকে খুব সুন্দর দেখে দুটো ক্রিস্টমাস উপহার দিলে কেমন হয়! দ্বিধার মধ্যে পড়ে যায় সৈকত। ভিন্ন সংস্কৃতির এই পরিবারের সাথে এভাবে এতটা জড়িয়ে পড়া কি ঠিক হবে তার? ইতিমধ্যে অনেকটাই জড়িয়ে পড়েছে সে। ভাবতে থাকে সৈকত।

[আনন্দধারার ২০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেপ্টেম্বর (২০১৭) মাসে কবি শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'দখিনা' পত্রিকায় যখন এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, তখনো লিজা জীবিত ছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হল, তার ঠিক দু'মাস বাদে নভেম্বর মাসে লিজা বাওয়েল ক্যান্সারে মারা যায়। লিজার মেয়ে অ্যানি এখন তার দূর সম্পর্কের এক খালার বাসাতে থাকে। আর সৈকত বর্তমানে অন্য এক সাবার্বে বসবাস করে।

আসলে সাহিত্যের পাতায় ঘটনাপুঞ্জ রংচঙে করে যেভাবেই বিবৃত করা হোক না কেন, বাস্তবতা বোধ হয় চিরকালই তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী নির্মম।]